ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা ॥ সংখ্যা ১০৪ ও ১০৫ (যুক্ত), সেপ্টেম্বর ২০২৪
ISSN : 2411-9059, e-ISSN: 3006-3078 DOI : http://dx.doi.org/10.62296/DVP/10405/017

দেলঠাকুরের গীত : বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের একটি কৃত্যনাট্য

সুদীপ চক্রবর্তী*

সারসংক্ষেপ: In the agricultural-based traditional religious society of Bangladesh and West Bengal, the 'Del Thakur-er Geet' is an ancient ritual (ritual-festival) of Bangladesh. This festival takes place on the occasion of Chaitra Sankranti (the end of Bangla calendar year). Depending on the region, this ritual is called Shiv Thakur's song, Shiv-Gauri's song, Charak Puja, Del Puja, etc. Along with worship and rituals, the devotees of Del Thakur travel around their own villages and neighbouring villages accompanied by songs, dances and musical instruments. During this time, devotees performed mythological stories and characters of various gods and goddesses, including Shiva and Gauri, in the courtyards of the houses of traditional devotees and in the open (open) spaces of the market. The organic environment of dance-song-music-acting and the dual presence of the spectator and actor turned an open-empty-real-space of an agricultural-based house into a mythological space. The mythological god Shiva is transformed into a form of performance of Del Thakur. As a result, it can be seen as a ritual-theatre.

মুখ্যশব্দ : দেলঠাকুর, কৃত্যনাট্য, চৈত্রসংক্রান্তি, পুরাণ-প্রসঙ্গ

* সহযোগী অধ্যাপক, থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১. ভূমিকা

বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের কৃষিভিত্তিক সনাতন ধর্মাবলম্বী সমাজব্যবস্থায় চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে দেলঠাকুরের গীত একটি সুপ্রাচীন কৃত্যানুষ্ঠান (কৃত্য-উৎসব)। অঞ্চলভেদে এই কৃত্যানুষ্ঠান শিবঠাকুরের গীত, শিব-গৌরীর গীত, হর-পার্বতীর গীত, চড়কপূজা, দেউলপূজা প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়ে থাকে। কোথাও চৈত্র মাসের শেষ সাতদিন, আবার কোথাও চৈত্রমাসের শেষ দিনে শুরু হয়ে বৈশাখের প্রথম সাতদিন এই উৎসব পালিত হয়। পূজা-অর্চনার বা কৃত্য পালনের পাশাপাশি দেলঠাকুরের ভক্তরা গীত-নৃত্য-বাদ্য সহযোগে নিজগ্রাম ও পার্শ্ববর্তী গ্রাম পরিভ্রমণ করেন। এসময় ভক্তরা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বাড়ির উঠানে এবং হাটের বারোয়ারি খোলা (উন্মুক্ত) আয়তনে শিব-গৌরীসহ বিভিন্ন দেব-দেবী চরিত্র অভিনয়ের মাধ্যমে পৌরাণিক গল্প পরিবেশন করেন। উৎসবে মুখরিত হয়ে ওঠে গ্রাম-গ্রামান্তর। নৃত্য-গীত-বাদ্য-অভিনয়ের জৈব-পরিবেশনা এবং দর্শক-অভিনেতার যুগল উপস্থিতি কৃষিভিত্তিক জনপদের একটি উন্মুক্ত-শূন্য-বাস্তব-আয়তনকে পরিণত করে পৌরাণিক ঘটনাস্থলে। দেলঠাকুরের গীতে পৌরাণিক দেবতা শিবের লৌকিক রূপায়ণ ঘটে। ফলে দেখা যায়, দেলঠাকুরের গীতে কৃত্য ও নাট্যের সব উপাদান সক্রিয়ভাবে উপস্থিত।

বিশ্বাসীর হৃদয় উৎসারিত ধর্মভাব-প্রধান কাঠামোবদ্ধ ক্রিয়া যুগ-যুগান্তরের বহমানতায় পরিগণিত হয় কৃত্য হিসেবে। কৃত্যের ক্রিয়ামুখ্যতার কারণেই এটি হয়ে উঠে পরিবেশনামূলক (Schechner, 2002)। ধর্মভাবে উজ্জীবিত মানুষের সুনির্দিষ্ট 'কিছু করাই' তখন হয়ে ওঠে দর্শনযোগ্য অর্থাৎ এটি দর্শকের দ্বারা পরিদৃষ্টমান হয়। সর্বোপরি কৃত্য তখন হয়ে উঠে নাট্য। কেননা "একটি ত্রিমাত্রিক আয়তনে এক বা একাধিক মানুষ যখন অপর এক বা একাধিক মানুষের সম্মুখে একটি ক্রিয়া উপস্থাপন করে তাকেই নাট্য" বলে অভিহিত করা হয় (সৈয়দ জামিল, ১৯৯৫, পৃ. ১)। প্রাচীন বাংলায় ধর্মমূলক কৃত্যের স্রোত থেকে জেগে ওঠে নাট্যের বিচিত্র ধারা। প্রাচীন বাংলার বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের সাধনপদ্ধতি তথা বিভিন্ন কৃত্য সেকালেই নাট্যের রূপ পরিগ্রহ করে। মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত গ্রন্থে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ থেকে এই বক্তব্যের সমর্থনে একটি পদের উল্লেখ করা যায় :

নাচন্তি বাজিল গান্তিদেবী
বুদ্ধ নাটক বিষমা হোই। (হাই ও আনোয়ার, ১৯৮৯, পৃ ১০৮)

অর্থাৎ, নৃত্য, বাদ্য ও গীতের সমন্বিত প্রকাশের ফলে বুদ্ধনাটক কষ্টসাধ্য হয়। এইভাবে কৃত্য আর নাট্যের জৈবিক সংমিশ্রণে একটি নতুন পরিভাষার মর্যাদায় অভিষিক্ত হয় কৃত্যনাট্য। বাংলাদেশে বিচিত্র রূপের কৃত্যনাট্যের ধারা বহমান। মূলত দৃঢ়সংবদ্ধ সমাজ কাঠামোর ধর্মীয় চেতনার প্রায়োগিক রূপের মধ্যেই কৃত্যনাট্যের অস্তিত্বশীলতা পরিলক্ষিত হয়। কৃত্যনাট্যের ধর্মীয় চরিত্র ও শিল্পরস ব্যতিত রয়েছে আরেকটি বিশেষভাবে বিবেচনাযোগ্য প্রত্যয়। প্রত্যয়টি হলো কৃত্যনাট্যের সমাজতত্ত্ব। কৃত্যনাট্যের সাংস্কৃতিক মূল্য নিরূপণের জন্য মূলত এর সমাজতাত্ত্বিক বীক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কৃত্যনাট্যে অংশগ্রহণকারী ও উপভোগকারীর সামষ্টিক মনন ও সামাজিক অস্তিত্বকে বিশ্লেষণের জন্যই প্রয়োজন কৃত্যনাট্যের সমাজতাত্ত্বিক বিচার-বিবেচনা।

কৃত্যনাট্য মূলত সুনির্দিষ্ট একটি অপরিবর্তিত ও সংঘবদ্ধ সমাজ কাঠামোর মধ্যে প্রবহমান থাকে। সামাজিক পরিবর্তনের বিভিন্ন নিয়ামক উপাদানগুলোর প্রভাবে কৃত্যনাট্যের বাঁকবদল ঘটতে শুরু করেছে। এমনকি এর কৃত্য-বৈশিষ্ট্যের ক্রমহ্রাসমানতাও বর্তমানে পরিলক্ষিত হয়। যে সামাজিক প্রতিবেশে ও জীবন-কাঠামোর মধ্যে কৃত্যনাট্যের বিকাশ দেখা যায়– সেই সামাজিক প্রতিবেশ ও জীবনকাঠামোর পরিবর্তমানতার পটভূমিতে বর্তমান প্রবন্ধে কৃত্যনাট্যের সমাজতত্ত্ব বিশ্লেষিত হলো। নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও প্রশ্নপত্র পদ্ধতি অনুসৃত এই গবেষণায় অনুসন্ধানলব্ধ পর্যায়ক্রমিক ধাপগুলো নিম্নে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করা হলো।

দেলঠাকুরের ভক্তরা তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটানোর ব্রত নিয়ে চৈত্র সংক্রান্তিতে সপ্তাহব্যাপী মনোদৈহিক কৃত্যপালন করে থাকেন। উল্লেখযোগ্য কৃত্যগুলোর মধ্যে রয়েছে উপবাস পালন, সংযম সাধন, স্ত্রী সংসর্গ ত্যাগ, সাত দিন– সাত রাত গ্রামের বিভিন্ন বাড়ির আঙ্গিনায়, দেব থলিতে ও শ্মশানে গিয়ে পূজা দেওয়া এবং শরীরে শূল বিঁধে নৃত্য-গীতে অংশ নেওয়া। লক্ষ্যে অবিচল পূজারীরা সংযম পালন করেন, কৃত্যের আবরণে নিজেদের শরীরকে কষ্ট দেন এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। ভক্তদের বিশ্বাস এই যে, দেলঠাকুর তার সন্তানতুল্য অসহায় মানুষের প্রতি সদয় হবেন। পৃথিবীতে সুখ, সমৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, আয়ু, সর্বোপরি উন্নতি কামনা করেই দেলঠাকুরের উৎসব পালিত হয়।

এই প্রবন্ধের গবেষণাস্থল বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল খুলনা জেলার কয়রা থানাধীন ১ নম্বর ইউনিয়ন আমাদীর অন্তর্গত ৬ নম্বর ওয়ার্ড হাতিয়ারডাঙ্গা এবং তালবাড়িয়া গ্রাম। পূর্ব, পশ্চিম,

উত্তর ও দক্ষিণ চক নিয়ে হাতিয়ারডাঙ্গা গ্রাম। গ্রামের জনসংখ্যা প্রায় ৩,০০০। জনসংখ্যার অধিকাংশ সনাতন ধর্মাবলম্বী। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা সবাই ক্ষত্রিয়। গ্রামের ৮৫ ভাগ মানুষ কৃষিজীবী এবং ১৫ ভাগ সরকারি-বেসরকারি পেশায় নিযুক্ত। এই গ্রামে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৫টি এবং বেসরকারি একটি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। সাক্ষরতার হার ৯০ ভাগ। গ্রামে শুড়িখালী বাজারের সন্নিকটে পুরনো রাশমন্দির ১৩০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এছাড়া, এই গ্রামে ১০টি মন্দির এবং একটি দেবথান ও যজ্ঞস্থল রয়েছে। হাতিয়ারডাঙ্গা গ্রামের দেল উৎসবে গ্রামবাসীর সক্রিয় অংশগ্রহণ পর্যালোচনা করলে কৃত্যনাট্যের তিনটি ধাপ লক্ষ করা যায়। ধাপগুলো হলো :

১. ভক্তকুলের মানস ও কৃত্য আয়োজন।

২. কৃষক ও পেশাজীবীদের নিয়ে গঠিত গীতিদলের দিনব্যাপী পূজামণ্ডপ ও গ্রাম প্রদক্ষিণ।

৩. তরুণ বয়সী কৃষক, পেশাজীবী ও শিক্ষার্থীদের নিয়ে গঠিত নৃত্যদলের পৌরাণিক দেব-দেবী চরিত্রের বেশ ধারণ করে গ্রাম পরিভ্রমণ এবং বিভিন্ন বাড়ির উঠানে পৌরাণিক ঘটনার অভিনয় পরিবেশন।

ভক্তকুলের কৃত্য পালন

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে হিন্দু সম্প্রদায়ের ভক্তকুল পূর্বসূরি কর্তৃক প্রাপ্ত বা অনুসৃত রীতিনীতি অনুসরণ করে দেলঠাকুরের গীত উৎসব পালন করে থাকেন। অর্থাৎ ভক্তির মূলচিন্তা অখণ্ড রেখে তারা কৃত্যানুষ্ঠান উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে নিজ এলাকার পূজার নিয়মাবলির প্রতি অনুগত থাকেন। এক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গের সাথে দক্ষিণবঙ্গের কৃত্যাচারে অতিসামান্য পার্থক্য থাকতে পারে।

গ্রামে নিয়মানুসারে প্রতিবছর পালা করে বিভিন্ন পরিবার এই পূজা আয়োজনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পূজা পালনকারী পরিবারই মূলত পূজার সব ব্যয় নির্বাহ করেন। জানা যায়, এ পর্যন্ত পূজা-আয়োজক প্রায় সব পরিবারই কৃষিজীবী বা ধান ব্যবসায়ী। অর্থাৎ, কর্ষণের সাথে যুক্ত। পূজারি পরিবার চারদিনব্যাপী এই পূজার পূর্বাপর সপ্তাহখানেক আমিষ এবং বিলাস-বসন-ভূষণে সংযম সাধন করেন। যে বাড়িতে দেলপূজা আয়োজিত হয়, সে বাড়ির নাম দেউলবাড়ি। কৃত্যানুষ্ঠানের পুরোহিতকে গ্রামবাসী 'বালাদার' বলে সম্বোধন করেন। বালা শব্দের অর্থ মন্ত্র। অর্থাৎ দেল উৎসবে যিনি কৃত্যপালনের উদ্দেশ্যে মন্ত্র উচ্চারণ করেন তিনিই বালাদার। উৎসবের চারদিন বালাদার মণ্ডপবাড়িতেই অবস্থান নেন। উল্লেখ্য, মন্ত্রগুলো 'বালা শোলক' নামে পরিচিত। বালা শোলক বাংলা পদ্যে রচিত। এগুলো পরিবেশিত হয় কাব্য ছন্দে। পূজারি তার বাড়ির আঙ্গিনায় বা দেবতাঘরে দেলঠাকুরের আসন স্থাপন করেন। দেল উৎসবের প্রথম দিন দেলঠাকুরকে নিমন্ত্রণ দেয়া থেকে শুরু করে চতুর্থ দিন বিসর্জন অঞ্জলি দেওয়া পর্যন্ত গ্রামবাসীর শান্তি, স্থিতি, সমৃদ্ধি এবং উন্নতি কামনা করে কৃত্য সহকারে নৃত্য-গীত-অভিনয় পরিবেশনের নৃতাত্ত্বিক (ethnographic) গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত বিস্তারিত তথ্যের উল্লেখযোগ্য অংশসমূহ উল্লেখ করা হলো :

প্রথম দিন সূর্যাস্তের আগেই দেলঠাকুরকে নিমন্ত্রণ দেওয়া, স্থান শুদ্ধ এবং অঞ্জলি দেওয়ার মধ্য দিয়ে কৃত্যপালন শুরু হয়। তারপর পূজা আয়োজক দেউলবাড়িতে দেলঠাকুর বা শিবঠাকুরকেন্দ্রিক কৃত্য পালিত হয়। কৃত্য সহকারে দেউলবাড়ি থেকে অনতিদূরের জলের ঘাটে যাত্রা করা হয়। জলের ঘাট থেকে দেউলবাড়ি ফিরে আসার কৃত্যগুলো হলো পথ শুদ্ধ, দেউলবাড়ি এসে স্থান শুদ্ধ, স্থান পবিত্র, তারা নির্মাণ, তারা পূজা, অগ্নি পূজা, পঞ্চল শুদ্ধ, পঞ্চফল সন্ন্যাসীদের মধ্যে বিলি, তারা হতে লাফ দিয়ে পাটার, সন্ন্যাসীসহ মূল বালাদারের শ্মশানঘাটে হাজরা নিমন্ত্রণ, হনুমান নিমন্ত্রণ, খেজুরগাছ নিমন্ত্রণ ও চড়ক নিমন্ত্রণ করা।

দ্বিতীয় দিনের কৃত্য শুরু হয় সকালে। সকাল থেকে পূজারিরা স্থান শুদ্ধ, স্থান পবিত্র, শিবপূজার শোলক, শিবের প্রণামী, শিবের বন্দনা প্রভৃতি কৃত্যপালন শেষে গ্রামের বিভিন্ন বাড়িতে শিবঠাকুরের প্রতীক মাথায় বহন করে নিয়ে ভিক্ষা উত্তোলন করেন এবং শেষে দেউলবাড়িতে ফিরে শিবঠাকুরের বিশ্রাম আয়োজন করেন। এই ভিক্ষা উত্তোলন কৃত্যের মধ্য দিয়ে সামষ্টিক সামাজিক অংশগ্রহণের দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়।

তৃতীয় দিন কৃত্য বিকাল থেকে শুরু হয়। দিনব্যাপী কৃত্যানুষ্ঠানের শেষ হয় শিব ভক্তগণের পাটার নামক আত্মউৎসর্গীমূলক কৃত্য পালনের মাধ্যমে। গ্রাম সংলগ্ন নদীতীরে খোলা মাঠে ভক্তরা বাঁশের একটি উঁচু স্থান নির্মাণ করেন। এর নাম তাড়া। তরুণ এবং যুবক ভক্তরা এই তাড়ার উপরে উঠে নীচে মেলে ধরা জালে শিবঠাকুরের নামে ঝাঁপ দেন।

চতুর্থ দিনে উত্তরীয় নামানো, গরুর গোয়ালে ভগবতীর পূজা ও আরতি নিবেদনের মধ্য দিয়ে দেলঠাকুরের গীত কৃত্যানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

প্রথম দিন থেকে শেষ দিন অর্থাৎ চতুর্থ দিন পর্যন্ত কৃত্য পালন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ভক্তকূলের ও পূজারিদের আচরিত কৃত্যসমূহের মধ্যে বৈচিত্র্য রয়েছে। পূজার উপাচারের মধ্যে ফুল, ফল, জল প্রধান। কৃত্যানুষ্ঠানগুলো মাত্র একটি স্থানিক আয়তনের মধ্যে সীমিত না থেকে বিভিন্ন স্থানে উদযাপিত হচ্ছে। তবে তা নির্দিষ্ট কতগুলো স্থানকে অনুসরণ করেই আবর্তিত হয়। স্থানগুলোর মধ্যে নদীর ঘাট, দেউলবাড়ির উঠান, মন্দির আঙ্গিনা, উঁচু স্থান (খেজুর ভাঙার কৃত্য) উল্লেখযোগ্য। কৃত্যানুষ্ঠান পালনে সময়ের পার্থক্যও লক্ষণীয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রথম দিনের আয়োজন সকালে, অন্যদিনের আয়োজন সন্ধ্যায়। তবে পর্যায়ক্রমিকভাবে সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা, রাত সার্বক্ষণিক বিভিন্ন কৃত্যাচারের মধ্যেই দেলঠাকুরের ভক্তরা লীন হয়ে থাকেন; পূজারি, ভক্তকুল, দর্শনার্থী সকলের সক্রিয় ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ চলমান থাকে।

চিত্র ২ : গীত পরিবেশনা ও গ্রাম প্রদক্ষিণ

চিত্র ৩ : গীত পরিবেশনায় উৎসুক দর্শনার্থী

২. গীতিদলের দিনব্যাপী পূজামণ্ডপ ও গ্রাম প্রদক্ষিণ গীত

দেলঠাকুরের উৎসবে কৃতনাট্যের দ্বিতীয় ধাপ হলো কৃষক ও পেশাজীবীদের নিয়ে গঠিত গীতিদলের গ্রাম প্রদক্ষিণ ও গান পরিবেশনা। পাঁচ সদস্যের গীতিদলটি পূজামণ্ডপ ও গ্রামের বিভিন্ন বাড়ি ঘুরে ঘুরে শিব-দুর্গার তর্ক, তীর্থযাত্রা, শ্রীফলের জন্ম, ধান ভাঙা, বাবা তারকনাথ, শিব লীলা, প্রণামি, ভিক্ষার শ্লোক, হরের ভক্তি, গৌরীর খেদ, শিব-গৌরীর বিবাহ, জামাই বরণ ও হাজরার গান প্রভৃতি গীত পরিবেশন করেন। গীতিসমূহের মধ্যে শিব-দুর্গার তর্ক পাঠ করলেই বাঙলা নাট্যের উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায়। গীতটি নিম্নরূপ :

শিব-দুর্গার তর্ক

ধুয়া : মন আমার চঞ্চলা রে,
মন আমার চঞ্চলা কেন বা হইল।
কি জানি কৈলাস পুরে কি ঘটনা ঘটিল রে।

শিব :
শুন শুন হৈমবতী জিজ্ঞাসী তোমায়।
স্ব-ইচ্ছায় কেন যাও বাপেরও আলয়॥
তিন দিনে ছিলে তুমি পিতারও ভুবন।
ভাল দ্রব্য কি খাইলে কি দিল বসন॥

দুর্গা :
দরিদ্র আমার পিতা কোথা পাবে ধন।
কি দিয়া কিনিয়া দিবে আমার বসন॥
নড়িতে পারে না পিতা গতি শক্তিহীন।
লবণ হিন কচু সাগে গেল তিন দিন॥

শিব :
শুনেছি সকল কথা গনেশের ঠাঁই।
মেষ আজ কত ছিল নিরূপণ নাই॥

মোর সনে মিথ্যা বল কিসের কারণ।
তোমার পিতার অন্ন আমার নাহি প্রয়োজন॥

দুর্গা :
কথায় কথায় তোমার বুঝি হয় সূত্রপাত।
মোর সনে দ্বন্দ্ব কেন কর দিন রাত॥
কণ্ঠ ভরা বিষ তোমার কর্কট বচন।
ভিক্ষা করে নাহি হয় উদর পূরণ॥
পুত্র কন্যা ক্ষুধায় কাতর আছে চারিজন।
তোমার মতন অমন স্বামীর কপালে আগুন॥

শিব :
স্বামী ভক্তি কত তোমার চিরকাল জানি।
বুকে পদ দিয়ে দাঁড়াও হয়ে উলঙ্গিনী॥
রাখো না আমার বাক্য কর তৃণ জ্ঞান।
সতী রমণী কেন হেন আচরণ॥

দুর্গা :
কোন কার্যেতে অপমান করেছি তোমায়।
বলো বলো সত্য করি দেব-মৃত্যুঞ্জয়॥

শিব :
দক্ষ যজ্ঞে গিয়েছিলে মনে কি পড়ে না।
তথায় পাইলে কত দারুন লাঞ্ছনা॥
বাপের আলয় গিয়াছিলে বিনা নিমন্ত্রণে।
আমার নিষেধ বাক্য না শুনিলে কানে॥
বলো দেখি এ তোমার কেমন লক্ষণ।
কুলবতী রমণীর স্বভাব কি এমন॥

দুর্গা :

তোমার যে কুলমান কত দেখতে পাই।
সব কুল খেয়েছো তোমার কুলে কেহ নাই॥
কুল থাকিলে কোচের বাড়ী নিত্য করো বাসা।
মান থাকিলে বৃদ্ধকালে এত করো আশা॥
লাজ থাকিলে বসন ত্যাজি পরো ব্যাঘ্র ছাল।
ভয় থাকিলে কি সঙ-এ বশো চিরকাল॥

শিব :

যে মুখেতে কুল কুল গৌরব, শুনে হাসি পায়।
উলঙ্গিনী হয়ে যে-বা রণস্থলে যায়॥
লজ্জাহীনা বলে বসন নাহি কলেবরে।
ভয় থাকিলে কে বা যায় অসুর সমরে॥
ব্রহ্মাদ্বারে অচৈতন্য যাবৎ জীবন।
রাগেতে উদর পূর্ণা দেখি সর্বক্ষণ॥

দুর্গা :

তুমিতো চৈতন্য বড় সিদ্ধি ভাং খেয়ে।
চক্ষু রেগে থাকো বলো কিসের লাগিয়ে॥
নিরগুণ পুরুষ মাত্র বাক্য সার হয়।
ক্ষমতা যার আছে সে কি নিত্য বোঝা বয়॥

শিব :

মোর কেন গুণ নাই শুনো অজ্ঞা মান।
তোমার চক্ষে সুন্দ শম্ভু দৈত্য ধরে কি কারণ॥
বায়ু বেগে ঘুরাইলো শূন্যের উপর।
সেই সময় কোথায় ছিল ক্ষমতা তোমার॥

দুর্গা :
জানি জানি সব কথা আছে স্মরণ।
লোহাসুর যুদ্ধে কেন কর পলায়ন॥
হার মেনে আমার দিলে কার অঙ্গীকার।
তবে তার হাতে তুমি পাইলে নিস্তার॥

শিব-দুর্গার তর্ক-গীতের বাণী লক্ষ করলে বোঝা যায় এটি পয়ার ছন্দে রচিত। পৌরাণিক দেব-দেবী শিব-দুর্গার কথোপকথনের আড়ালে লৌকিক বাংলার গ্রামীণ সমাজে বাসরত দাম্পত্য-জীবনের আটপৌরে প্রাত্যহিক বিষয়াদি উপস্থাপিত হয়। শিব-দুর্গার সংসারে অন্নবস্ত্রের ঘাটতি মূলত গ্রামীণ সমাজের দারিদ্র্যপীড়িত সাংসারিক জীবনের কাব্য-রূপায়ণ। পিতার গৃহে গমন, সন্তানদের আবদার, স্বামীর ঔদাসীন্য ইত্যাদি লৌকিক ঘটনাসমূহ পৌরাণিক দেব-দেবীর চরিত্রে স্থান পেয়েছে। দেব-দেবী যেন এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মতই। তারাও যেন অভাব অনটন ও সংকটের উর্ধ্বে নয়। গীতের শেষে ভণিতা আকারে রচয়িতার নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।ক যেমন :

এই রূপেতে উভয়তে দ্বন্দ্ব যে হইল
তার কিছু মাত্র 'রতিকান্ত' রচনা করিল॥

২. **নৃত্যদলের গীত-বাদ্য-নৃত্য-পোশাক-রূপসজ্জা সহযোগে নিজ গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ পরিভ্রমণ শেষে নির্দিষ্ট বাড়ির আঙ্গিনায় পৌরাণিক দেব-দেবীর চরিত্রাভিনয় ও ঘটনাসমূহ পরিবেশন**

কৃত্যনাট্যের সর্বশেষ বা তৃতীয় ধাপটি হলো চরিত্রাভিনয়। অনুষ্ঠানের এই পর্বটি প্রদর্শিত হয়ে থাকে বিভিন্ন বয়সী পেশাজীবী সমভিব্যাহারে। সম্পূর্ণ ভক্তিমূলক এই পরিবেশনায় নির্বাক অভিনয় ও নৃত্যের যৌথ প্রয়োগ লক্ষণীয়। দেলঠাকুরের উৎসবের চরিত্রাভিনয়ের উদ্দেশ্যে হাতিয়ারডাঙ্গা গ্রামের তরুণ বয়সী কৃষক, পেশাজীবী ও স্কুল কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। তাদের স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনায় গঠিত হয় নৃত্যদল। এই নৃত্যদলই পৌরাণিক দেবদেবী চরিত্রের অভিনয়ের পাশাপাশি সমকালীন বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক রীতিতে সঙ অভিনয়ের মাধ্যমে সমাজের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের রাজনীতি-সচেতন দৃষ্টির প্রতিফলন ঘটান। তারা নিজ গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ পরিভ্রমণ

শেষে নির্দিষ্ট বাড়ির আঙ্গিনায় চরিত্রাভিনয় সম্পন্ন করেন। ঠিক কতো বছর আগে থেকে এই উৎসব হাতিয়ারডাঙ্গা গ্রামে পালিত হয়, তা উপরিউক্ত পরিবেশনার অভিনয় কুশীলব বিমল ঢালীর জ্ঞানের বাইরে। তবে তিনি যে খুব ছোটো থেকে এ উৎসবে অংশগ্রহণ করেন তার মনে আছে। শৈশব থেকে বাবা ও কাকাকে বিভিন্ন দেবদেবীর চরিত্রে সেজে অভিনয় করতে দেখেছেন। এখন তার বয়স ৭৫। দীর্ঘ ২৫ বছর তিনি ছিলেন এতদঞ্চলের সবচেয়ে শক্তিশালী 'মহাদেব' নাচিয়ে। তার বয়স হয়েছে, শরীরের উপর গেছে অনেক ধকল। তাই এখন আর আগের মত নৃত্য এবং অভিনয়ে অংশগ্রহণ করতে পারেন না। তার মতে, মহাদেব চরিত্রে নাচের জন্য অনেক শক্তি প্রয়োজন। সারাবছর শক্তি সঞ্চয় করতে হয় এই উৎসবে নৃত্যাভিনয়ের জন্য। তার ছেলে ঝংকার ঢালী খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের শিক্ষার্থী। দেবী দুর্গা চরিত্রে ঝংকার সবচেয়ে সুদর্শন ও চমৎকার অভিনেতা বলে গ্রামবাসী মনে করেন। প্রতিবছর এই উৎসবে অংশগ্রহণ করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রমের ভেতর থেকে সময় বের করে তিনি বাড়ি চলে আসেন।

হাতিয়ারডাঙ্গা মধ্যচকের নৃত্যদলের নাম 'সবুজ সংঘ'। পাঁচ বছর বয়সী শিশু থেকে পঞ্চাশ বছর বয়সী পর্যন্ত বিভিন্ন পেশার মানুষ দেব-দেবী ও সঙ চরিত্রে অভিনয় করেন। তাঁরা চরিত্র অনুযায়ী পোশাক ও রূপসজ্জা নিতে সকাল থেকেই অনিল সরকারের বাড়ির গোয়াল ঘরের পাশে ভিড় জমাতে থাকেন। জিংক অক্সাইডের তৈরি রঙের প্রলেপ, আলাদা চুল ও বাড়ির মহিলাদের ঝকমকে জরিওয়ালা শাড়ি, গহনা আর নানা উজ্জ্বল রঙের বস্ত্রে আবৃত হবার পর তাদের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়। সকাল সাড়ে এগারোটায় শুরু হয় সবুজ সংঘ নৃত্যদলের অভিযাত্রা। প্রায় ৪০ সদস্য বিশিষ্ট এই দল গ্রামের দেলঠাকুরের মণ্ডপে বাদ্য-নৃত্যসহযোগে শিব-গৌরীর যুগলনৃত্য, কালীর তাণ্ডবনৃত্য এবং সম্মিলিত বন্দনা সেরে গ্রামের পুরোনো জমিদার বাড়ির আঙিনায় জড়ো হন। মাথার উপর প্রচণ্ড তেজ নিয়ে সূর্য-বিকিরণ উপেক্ষা করে আঙিনায় এসে জড়ো হন গ্রামের বিভিন্ন বয়সের দর্শনার্থী। প্রায় দেড়ঘণ্টা ধরে সম্মিলিত বন্দনা ও বিভিন্ন পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বনে দেব-দেবীর চরিত্র অভিনীত হয়। এর মধ্যে অন্যতম নাট্যদৃশ্যসমূহ নিম্নরূপ :

ক. সম্মিলিত বন্দনা
খ. মহিষাসুর বধ
গ. নিধুবনে কৃষ্ণকালী
ঘ. চণ্ডীদাস-রজকিনীর প্রেম

ঙ. তারকা রাক্ষসী বধ
চ. পঞ্চতত্ত্ব
ছ. ভক্ত রামপ্রসাদ
জ. কলি রাজা
ঝ. অভিমন্যু বধ
ঞ. বেহুলা-লক্ষ্মীন্দরের বাসর
ট. কৃষ্ণের অষ্টসখি লীলা

এছাড়াও স্থানীয় বিভিন্ন কৌতুকোদ্দীপক ঘটনা ও দেশের সমকালীন পরিস্থিতি নিয়ে সঙ ও জাদু প্রদর্শিত হয়। উল্লেখ্য, পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বনে চরিত্রাভিনয়ে অভিনেতারা কোনোরূপ সংলাপ, গান বা কণ্ঠনিঃসৃত শব্দ ব্যবহার করেন না। নির্দিষ্ট একটি ছন্দের তালে তালে নৃত্যের মাধ্যমে গল্প পরিবেশিত হয়। নৃত্যদলের পরিচালক সুনীল বিশ্বাসের ডান হাতের লাঠির ইঙ্গিত ও বাঁ হাতের বাঁশিতে ফু, সাথে ঢোলের নির্দিষ্ট আওয়াজ ও ঝাঁঝের ধ্বনি – এ সকল যন্ত্রসংগীতই অভিনেতাদের জন্য নির্দেশনা। অভিনয় উপস্থাপন ও গল্প পরিবেশনায় গুরুত্বপূর্ণ যে কৌশল অবলম্বন করতে দেখা যায়, তা হলো 'নির্বাক অভিনয়'।

চিত্র ৪ : রূপসজ্জা

চিত্র ৫ : পৌরাণিক চরিত্রাভিনয়

চরিত্রের হাঁটা, চলা, বসা, অভিব্যক্তি সর্বোপরি শারীরিক চলন এবং মঞ্চে উপস্থিত চরিত্রের মধ্যকার শারীরিক দূরত্ব, শারীরিক নৈকট্য বা অবস্থান দেখে দর্শক খুব সহজেই ঘটনা ও চরিত্রের মধ্যকার সম্পর্ক অনুধাবন করতে সমর্থ হন। উল্লেখ্য, চরিত্রানুযায়ী পোশাক,

রূপসজ্জা ও দ্রব্যাদির ব্যবহারেও দর্শকের কাছে চরিত্রের পরিচয় সহজেই উন্মোচিত হয়। অভিনীত বিভিন্ন চরিত্র ও অভিনেতার নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

চরিত্রের নাম	অভিনেতার নাম	অভিনেতার বয়স	অভিনেতার পেশা
শিব/মহাদেব	বিমল ঢালী	৭৫	কৃষক
সীতা/রাধা/গৌরী	ঝংকার ঢালী	২৪	ছাত্র
কালী	সুজিত বাইন	৩০	কৃষক
চণ্ডীদাস	ভোলানাথ মণ্ডল	২৬	ছাত্র
রজকিনী/বেহুলা	রূপক মণ্ডল	১৮	ছাত্র
মহাদেব	গোপাল বাছাড়	২৪	ছাত্র
ঠাকুর	বিদ্যুৎ সরকার	২৫	ছাত্র
রাম	সুকুমার সানা	২৪	ছাত্র
লক্ষ্মণ	সনজিত সরকার	২৩	ছাত্র
বিশ্বামিত্র	সুশান্ত সরকার	২৮	ভূমিমালিক
তারকা রাক্ষসী	টিকেন্দ্র চন্দ্র মণ্ডল	৩৫	কৃষক
কুটিলা	বিশ্বনাথ সরকার	২৭	ব্যবসায়ী
কলি রাজা	উমেশ মণ্ডল	২৬	বেকার
সঙ	বিশ্বজিৎ, হীরক, দীপন, ধীমান, প্রসেনজিৎ	০৭-১৪	ছাত্র
মনসা	অনিমেষ বিশ্বাস	২২	ছাত্র
লক্ষ্মীন্দর	পবিত্র বিশ্বাস	২৬	ছাত্র
পঞ্চতত্ত্ব (গৌর, নিতাই, অদ্বৈতাচার্য, নিত্যানন্দ)	জয়, হিমেশ, শিবপদ, হিমেশ, রঘুনাথ ও অমৃত	০৮-১৫	ছাত্র
মহিষাসুর	কার্তিক সরকার	২৬	ব্যবসায়ী

কৃত্যনাট্যের এই অংশে লক্ষণীয় বিষয় হলো পৌরাণিক দেব-দেবীর চরিত্রাভিনয়ের পাশাপাশি সঙ-অভিনয়। সঙের ব্যাঙ্গাত্মক অভিনয়ের মাধ্যমে সমাজে বিদ্যমান নানাবিধ সামাজিক অনাচার ও পীড়নের চিত্র তুলে ধরা হয়। ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়ে থাকে, যেখানে স্থানীয় জনসাধারণ নিজ সম্প্রদায়কৃত সারা বছরের কার্যকলাপ মূল্যায়নের সুযোগ পায়। শাসন ক্ষমতার মূলকাঠামোকে বা সমাজ ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করা কৃত্যনাট্যের এই অংশটি বাংলা সংস্কৃতিভুক্ত নাট্য-রীতিতে যে বিশেষ ভূমিকা রাখে তা অনস্বীকার্য (Ahmed, 1996)। পরিশেষে, লক্ষণীয় বিষয় হলো, কৃত্যনাট্যের এ অংশে দেবী চরিত্রে পুরুষ অভিনেতারা অভিনয় করেলেও, একটি ভ্রাম্যমাণ পরিবেশনায় কালী চরিত্রাভিনয়ে একজন কিশোরীকে অভিনয় করতে দেখা যায়।

চিত্র ৬ : কালি ও শিবের চরিত্রাভিনয়

চিত্র ৭ : সঙ অভিনয়

নৃ-বিজ্ঞানী ভিক্টর টার্নার (Turner, 1982) সমাজ কাঠামো ব্যাখ্যা করে বলেন :

> প্রত্যেক সমাজ ব্যবস্থায়, হতে পারে আদিবাসীভিত্তিক অথবা জাতিভিত্তিক, শ্রেণি পরম্পরা বিরাজ করে যাদের প্রত্যেক শ্রেণির নিজস্ব সামাজিক অবস্থান ও ভূমিকা আছে ছোট সমাজ ব্যবস্থায়। এই সকল শ্রেণি গঠিত হতে পারে নৃ-তাত্ত্বিক গোষ্ঠী, ধর্মীয়-রাজনৈতিক দল ও লিঙ্গভিত্তিক সংঘের মাধ্যমে। প্রত্যেক গোষ্ঠী বা দল তাদের নিজস্ব স্বার্থ বৃদ্ধি করতে চাইলে অন্য গোষ্ঠীকে বাধা প্রদান করে। কারণ তারা মনে করে অন্যের স্বার্থের বর্ধন অর্থ হলো নিজেদের স্বার্থের হানি। ফলে দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে (p. 12)।

দ্বন্দ্বের এই আদি ও চিরন্তন রূপ এবং তার সমাধানকে টার্নার "সামাজিক নাটক" ("social drama") হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তিনি তার ধারণা ব্যাখ্যা করে দেখান যে, সামাজিক নাটকে বিরাজিত দ্বন্দ্ব কতগুলো ধাপের মধ্য দিয়ে পর্যায়ক্রমিকভাবে অগ্রসর হয়। ধাপগুলো হলো : ভাঙন, সংকট, প্রতিকার এবং পুনঃসংহতি (সৈয়দ জামিল, ১৯৯৫, পৃপৃ. ১২৬-১৩৪)। সামাজিক বিভিন্ন দল বা গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বকে 'অনির্ধারণ' ও 'নির্ধারণ'-এর উপায়গুলোর মধ্যে সংঘটিত স্বার্থের দ্বন্দ্বের ফল হিসেবে দেখা যায়। অনির্ধারণ হলো সেই সকল ইচ্ছা ও সম্ভাবনা যা এখনও মানুষের চেতনায় আর্বিভূত হয়নি। অর্থাৎ যা হতে পারে, যা হওয়া উচিত বা যা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আর নির্ধারণের উপায় হলো সমাজে বিরাজিত আদর্শভিত্তিক কাঠামো যা সমাজকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করার প্রচেষ্টা চালায়।

'দেলঠাকুরের গীত' শীর্ষক কৃত্যনাট্য, টার্নারের ব্যাখ্যা অনুসরণ করলে যে মত পাওয়া যায়, ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য নিয়েই 'অনির্ধারণ' ও 'নির্ধারণ'-এর যুগ্মতায় হয়ে ওঠে সামাজিক নাটক– যা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে একটি ছোট জনগোষ্ঠীর সামাজিক সংহতি সৃষ্টি করে। 'দেলঠাকুরের গীত'-এর পরিবেশনামূলক বৈশিষ্ট্যের কারণেই মূলত পরিবেশনাকারী ও উপভোগকারী– এই রকম দুটি সমঝোতামূলক সামাজিক দল তৈরি করে। এই দুটি দলের মিথস্ক্রিয়ার মধ্যেই সামাজিক সংহতির বীজ নিহিত থাকে। দেখা যাচ্ছে, কৃত্য পালনের মধ্য দিয়ে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষ তার সমাজের সাংস্কৃতিক বলয় নির্মাণে ভূমিকা রাখছে। এই ভূমিকা রাখার কারণেই কৃত্য পালনকারী ও উপভোগকারী উভয়ই রূপান্তরিত হয় নাট্যের কুশীলব ও সমাজ কাঠামোর নির্মাতা হিসেবে। মূলত একটি বদ্ধ সমাজের স্বতশ্চলতা তৈরি করে এই ধরনের কৃত্যনাট্যের মধ্য দিয়ে সেই সমাজ হয়ে ওঠে কার্যকর, যেখানে নিরন্তর তৈরি হয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার একটি উভয়মুখী প্রক্রিয়া। লোকসমাজে ধর্মীয় কৃত্য পালনের এই অনুষ্ঠান একটা পর্যায়েও কৃত্যের মধ্যে থেকেও হয়ে ওঠে সামাজিক উৎসবের রূপক। রিচার্ড শেখনার বলেন, কৃত্য-পালন ব্যতীত আমরা আমাদের জীবনের একটি দিনও অতিবাহিত করতে পারি না, সেটা যে ধরনের কৃত্য হোক, নিরপেক্ষ, প্রাত্যহিক কিংবা ধর্মীয়। বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি মানুষ ধর্ম পালনের মাধ্যমে ধর্মীয় কৃত্যের অংশীদার হন।

কৃত্যনাট্যের সমাজতাত্ত্বিক বিবেচনার ক্ষেত্রে এর সামাজিক সংহতি সৃষ্টিকারী ভূমিকাটি সর্বাগ্রগণ্য হলেও বর্তমান গবেষণায় দেখা যায় এর বিপরীতধর্মী একটি প্রবণতা। তা হলো, কৃত্যের বিশ্বাসমূলক উপাদানের ক্রমাগত বিলীয়মানতা কিংবা স্বয়ংক্রিয় অপসারণ। কেননা

সনাতন উৎপাদন ব্যবস্থায় সমাজ কাঠামোতে পরিবর্তনহীনতার কারণে কৃত্যানুষ্ঠানের দীর্ঘস্থায়িত্ব তৈরি হয়েছিল। কৃত্যানুষ্ঠানের দীর্ঘস্থায়িত্ব বসবাসরত সামাজিকগণের মধ্যকার পারস্পারিক সম্পর্কের গাঁথুনি মজবুত করে; এমিল ডুর্খেইম যেটাকে "সামাজিক সংহতি" ("social solidarity") হিসেবে আখ্যা দিয়েছে। এই সংহতিই সংঘবদ্ধ হয়ে সমাজে একত্রে বসবাস করার ও দলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ক্রিয়ায় যুক্ত হওয়ার প্রধান চালিকা শক্তি (|Durkheim, 1983)| কিন্তু বর্তমানে সামাজিক পরিবর্তনে কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়ামক উপাদান অর্থাৎ আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান ও তথ্য- প্রযুক্তি, যোগাযোগ ব্যবস্থার বহুমাত্রিক প্রভাব এবং নতুন, বিচিত্র পেশাগত জীবনের হাতছানি সেই সমাজের মানুষদের জীবনে তৈরি করে দিয়েছে এক নতুন বাস্তবতা। তাই কৃত্য পালনকারীদের মধ্যে তৈরি হয়েছে ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনের বোধ, বিচ্ছিন্নতা ও নগরবাসের অভিজ্ঞতা। এর ফলে কৃত্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে সৃষ্ট সামাজিক সংহতির বিপরীতে এখন বিচ্ছিন্নতার এক নতুন স্রোত তৈরি হয়েছে। কৃত্যনাট্যের এই নতুন সমাজ পটভূমিতে দেখা যায়, একদা কৃত্যানুষ্ঠানকারীদের চিত্তের সংশয় ও দোলাচল।

তবে 'দেলঠাকুরের গীত' শীর্ষক কৃত্যনাট্যের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে। সর্বোপরি তাদের পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার একটি ভিন্নমাত্রিক প্রতিফলন ঘটে এই কৃত্যনাট্যে। বিশেষ ধর্মীয় পরিস্থিতিতে সামাজিক সত্তা হিসেবে মানুষের আবির্ভূত হওয়া ও বিচরণ করার যে পরিকল্পিত প্রস্তুতি – এও পরিলক্ষিত হয় এই কৃত্যনাট্যে। পোশাকের রং, রূপসজ্জা, অঙ্গভঙ্গি, শারীরিক মুদ্রা, প্রাত্যহিকতা অতিক্রান্ত ভাষা ও ছন্দ নির্মাণের প্রচেষ্টার মধ্যে সেই সমাজের একটি নৃ-বৈজ্ঞানিক রূপরেখা প্রতিভাত হয়। সময়ের বহমানতায় এইসব কৃত্যনাট্য হয়ত একদিন ধর্মীয় সংশ্লিষ্টতা সর্বাঙ্গভাবেই হারিয়ে ফেলবে। তখন সেই সমাজের পলায়নপর ও স্মৃতিকাতর মানুষ তার সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তির নতুন স্রোত তৈরির জন্যই কৃত্যনাট্যের বিনির্মাণের ক্ষেত্রে নতুন শিল্পচেষ্টা চালাবে।

টীকা

ক. গীতিদলের মূল গায়েন বিশ্বজিৎ সরকার, যিনি আবার হারমোনিয়াম মাস্টারও। অন্য গায়েনরা হলেন রমেশচন্দ্র সরকার, তারক মণ্ডল, বিশ্বরঞ্জন সরকার, অভিজিৎ সরকার; ঢোল বাদ্যে অমল সরকার এবং গীতিদলের প্রম্পটার হলেন হরপ্রসাদ মণ্ডল।

খ. পৌরাণিক দেব-দেবীর চরিত্রাভিনয় ও ঘটনাসমূহ পরিবেশনার পরিচালকের নাম সুনীল বিশ্বাস (৩৪) এবং ঢোলবাদক দীপক সরকার (২৭)।

সহায়কপঞ্জি

সৈয়দ জামিল আহমেদ। (১৯৯৫)। *হাজার বছর : বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকলা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

হাই, মুহম্মদ আব্দুল ও আনোয়ার পাশা (সম্পা.)। (১৯৮৯)। *চর্যাগীতিকা*, ঢাকা।

Turner, V. (1982). 'From Ritual to Theatre: The Human Seriousness of Play', *Performing Arts Journal Publication*, New York.

Ahmed, S. J. (1996). 'From theatre to anthropology: Victor Turner's Social drama'. *The Dhaka University Studies*, 50(2).

Schechner, R. (2002). *Performance Studies: An Introduction*, Routledge, London.

Durkheim, E. (1983). *The division of labor in society: A study of the organization of higher societies,* Les Presses Universitairies de France, Paris.